BL College Journal
Full PDF
www.blcollege.edu.bd
ISSN 2664-228X (Print)
ISSN 2710-3684 (Online)
Volume -IV, Issue-I, July 2022
Pp. 83-105

চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যভাবনা বনাম চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যপ্রেম

শেলী দত্ত

সারসংক্ষেপ

বৈষ্ণবীয় সাহিত্যের মুখ্য রস হচ্ছে 'মধুর' রস যেখানে শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসও বর্তমান। যা পর্যায়ক্রমে হৃদয়লোকে দানা বাঁধে আর এই রসের ভিত্তিতেই ভক্ত ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কে বাঁধা পড়েন। তবে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে দাস্য রস আর বৈষ্ণব সমাজেও দাস্যরসের এক বিশেষ স্থান রয়েছে। তাই চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের রচনাতেও যেমন দাস্যরস বর্তমান ছিল তেমনি চৈতন্য পরবর্তী রচনাতেও দাস্যরসের কথা এসেছে বিভিন্ন ভাবে। রস হচ্ছে ভাবেরই প্রকাশ তাই এই দাস্যভাবনা ভক্তের ভাবকে আশ্রয় করে মধুরে এসে প্রেমে (দাস্যপ্রেম) পরিণত হয় যা চৈতন্য পরবর্তী যুগে এসেই সম্ভব হয়েছিল। চৈতন্য পূর্ববর্তী এই যে দাস্যভাব চৈতন্য পরবর্তীতে দাস্যপ্রেমে পরিণত হওয়ার যে পথ তা নির্দিষ্ট করারই প্রয়াস করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

শেলী দত্ত
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
তিনসুকিয়া মহাবিদ্যালয়
আসাম, ভারত
e-mail: dttamomi@gmail.com

বীজ শব্দ

দাস্যভাবনা, দাস্যপ্রেম, বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, কৈতব ভক্তি, অকৈতব ভক্তি

গবেষণার উদ্দেশ্য

বৈষ্ণব পদাবলি নিয়ে অনেক আলোচনা চোখে পড়েছে, তবে সরাসরি এই বিষয়টির উপর কোনো আলোচক অথবা লেখকই তেমনভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করেননি, তাই সহায়ক গ্রন্থের সাহায্যে উক্ত বিষয়টিকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে চৈতন্য পূর্ববর্তী আর চৈতন্য পরবর্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন করার প্রয়াস করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান প্রবন্ধে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন আকরগ্রন্থ, সমালোচনা গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বিশ্লেষণ

মধ্যযুগে সর্বভারতীয় স্তরে ভক্তিকে নিয়ে গড়ে ওঠা ভক্তিআন্দোলন, আসলেই ছিল মানবতাবাদকে স্বীকৃতি দেওয়ার লড়াই, তাই ভক্তিতেও মানবতাবাদ ফুটে উঠেছিল সেদিন, স্থানে স্থানে এক একজন পথিক হয়েছিলেন এর কর্ণধার, আর সেই সূত্র ধরেই বঙ্গে এলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি হয়ে উঠলেন মধ্যযুগের মধ্যমণি, তাই মধ্যযুগীয় সাহিত্যসমূহকে যে দুটি ধারায় ভাগ করা হয়েছে, সেখানে চৈতন্যকে সামনে রেখেই এই দুই ধারার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে, এই কথা মাথায় রেখেই উক্ত অধ্যায়কেও চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং চৈতন্য পরবর্তী এই দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যভাবনা

চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। সেই দ্বাদশ শতকেই, যখন জয়দেব এলেন। জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় লেখা হলেও তার হাতেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ প্রথম পাওয়া গেছে বলে বাংলায় মেনে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশেও বৈষ্ণবদের একটি ধারা সেসময় উজ্জীবিত ছিল, সঙ্গে বিষ্ণুর উপাসনাও ছিল। তাঁরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমমহিমা বর্ণন ও ভজন-কীর্তন-নৃত্য ইত্যাদিতে মগ্ন ছিলেন। এঁরা রাধাকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন, এককথায় বলতে গেলে এঁরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; যদিও, সংখ্যাগরিষ্ঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে এঁদের যোগ নেই বললেই চলে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বৈষ্ণব সহজিয়ারা জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়ুচণ্ডীদাসকে সহজিয়া ধর্মপ্রবর্তকের পূর্বসূরী বলে গণ্য করেন।[১] তাঁদের রচিত পদ বৈষ্ণব পদাবলির অন্তর্ভুক্ত হলেও অনেকেই তাঁদের পদগুলোকে'শুদ্ধ বৈষ্ণবপদের' (যে সমস্ত পদ চৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর রচিত হয়) আখ্যা থেকে বিরত রেখেছেন। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন–

> "চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রচলিত সংস্করণে যেসব পদ সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তাহাতে শুদ্ধ বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সম্বন্ধযুক্ত পদের মিশ্রণ আছে।"[২]

এখানে প্রথমত, একাধিক চণ্ডীদাস, আর চৈতন্যপরবর্তী কোনো এক চণ্ডীদাসের উপস্থিতি এবং পদের মিশ্রণ ঘটেছে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এভাবে অনেকেই এই একাধিক চণ্ডীদাসের উপস্থিতিকে স্বীকার করেছেন, বাংলা সাহিত্যে একাধিক চণ্ডীদাস নিয়ে অনেক বিতর্কও রয়েছে। তাঁদের মত এই যে, যিনি "সই কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম / কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো / আকুল করিল মোর প্রাণ।"[৩] এই পদটি লিখেছেন, তিনি কখনই চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের কবি হতে পারেন না। কারণ এই পদে 'নামমাহাত্ম্য' এসেছে, এসেছে জপের প্রসঙ্গ। যে 'জপমাহাত্ম্য' চৈতন্যই বঙ্গদেশে নিয়ে এসেছিলেন–

> (ক) "কলিকালের নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
> নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ নিস্তার।।"[৪]

(খ) "প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র,
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার,
সর্বক্ষণ বলো ইথে বিধি নাহি আর।।"[৫]

(গ) "কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব
যেই যপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভার।।"[৬]

ইত্যাদি

চৈতন্য জীবনীকাব্যের এমন দৃষ্টান্ত আরোও অনেক রয়েছে, যা বঙ্গদেশে চৈতন্যের 'নামমাহাত্ম্য' প্রচারের স্বাক্ষর বহন করছে। কাজেই চণ্ডীদাস যখন লিখলেন "জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলো গো / কেমনে বা পাসরিব তারে"[৭], তখনই এই কবি যে চৈতন্যপরবর্তী যুগের এই দিকটি আরোও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কাজেই চণ্ডীদাসের পদে ইন্দ্রিয়কে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করার যে প্রক্রিয়া তা চৈতন্য পরবর্তী যুগের ভাবনার আদলেই রচিত বলে মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এবার উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উপরে উল্লেখ্য বক্তব্যের দ্বিতীয়ত যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা আলোকপাত করা যেতে পারে।

'শুদ্ধ বৈষ্ণবদের সহিত সহজিয়া মতের সম্বন্ধযুক্ত পদের মিশ্রণ আছে' অর্থাৎ সহজিয়া পদগুলো শুদ্ধ বৈষ্ণবপদ যে নয় প্রকারান্তরে এই দিকটিও ব্যক্ত করা হয়েছে। এই পার্থক্যের হেতু বিচার করলে যে কারণগুলো দাঁড়ায় তা হচ্ছে–

(১) চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন যেসমস্ত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদের অনুসরণ করেছিলেন তা ছিল প্রেমের প্রতীক। নিতান্তই কামনানির্ভর। আসলে মানুষের/সমাজের মনের খোরাক, পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করে, সেদিক থেকে তখনকার সমাজের চাহিদাকে বজিয়ে রেখেই রাধাকৃষ্ণের পদগুলো রচিত হয়েছিল। তাই উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আরোও লিখেছেন, "পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা কীভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করলে একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে এইসব রচনার মূলে কোনো ধর্মের প্রেরণা ছিল না, ইহা ছিল নিতান্তই কাব্যগত প্রেরণা।"[৮] আবার শশীভূষণ দাশগুপ্ত এই প্রসঙ্গে লিখছেন, "যে 'গীতগোবিন্দ'-এ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার পূর্ণাঙ্গ রূপ আমরা দেখতে পাই, তাহাতে আধ্যাত্মিক আবহাওয়া অপেক্ষা কাব্যের আবহাওয়াই স্ফুটতর।"[৯] স্বভাবতই এই সময়ে জাত ভক্তিও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সেই 'প্রেমভক্তির' সূচক ছিল না, একথা সহজেই বলা যায়, কারণ 'বিলাসকলার' মধ্যে যে আত্মতৃপ্তি তখনকার বৈষ্ণবীয় কুল খুঁজছিল তা কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা (পরবর্তী আলোচনায় এই দিকটি আরও স্পষ্ট করা হবে)।

(২) চৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম 'রাগমার্গে' ভজনকে প্রাধান্য দিয়েছিল। তাই 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বলা হয়েছে "রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম কর্ম"[১০] কিন্তু সহজিয়ারা ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত সাধনার অধীন, ফলে তাঁরা

পার্থিব চাওয়া-পাওয়াকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাই তাঁরা ধর্মে ও বিধিবদ্ধ কর্মে মনোযোগী ছিলেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে যোগসাধনার উল্লেখ এই দিকটিই প্রমাণ করে সঙ্গে ইড়া, পিঙ্গলা শব্দাদির ব্যবহারে চৈতন্যপূর্ববর্তী কবিদের সহজিয়াপন্থার অনুসরণকে আরও স্পষ্টতর করে তোলে যা জ্ঞানমার্গাধীন আর গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে তাঁদের বিন্যস্ত করে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হল,

"অহোনিশি যোগ ধেআই।
মন পবন গগনে রেহাই।।
মূল কমলে করিলে মধুপান।
এঁবে পাইঞা আহ্মে ব্রহ্মগেয়ান।।
দূর আনুসর সুন্দরি রাহি
মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী।।
ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না সন্ধী।
মন পবন তাত কৈলো বন্দী।।
দশমী দুয়ারে দিলোঁ কপাট
এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট।"[১১]

প্রসঙ্গে বিশেষ করে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন, "ইহাতে মন পবন, মূল কমল, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, দশমী দুয়ার– পাবিধানিক শব্দগুলো হঠযোগ ও সহজযানে প্রচলিত। ইহাতে মনে হয় বড়ু চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন।"[১২] সে যাই হোক চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি বিদ্যাপতি, বড়ুচণ্ডীদাস, দ্বিজচণ্ডীদাস আদির সহজিয়া সাধন-ভজনজ্ঞাপক 'রাগাত্মিকা' পদের মধ্যেই যে সেদিন বৈষ্ণবীয় পদের ধারাটি রক্ষিত ছিল একথা অস্বীকার করা যায় না, উদাহরণের মধ্য দিয়ে এই দিকগুলো আলোকপাত করা যেতে পারে–

(ক) "এমন ব্যথিত নাই ডাকে রাধা বলি
বন্ধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।"[১৩]

–চণ্ডীদাস

(খ) "কৈছনে যাইব যমুনা তীর
কৈছে নেহার কুঞ্জ কুটীর।।
সহচরী সঙ্গে যাঁহা কয়ল ফুল খেরি
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি।।"[১৪]

–বিদ্যাপতি

দেখা যায়, এই পদসাহিত্য প্রাচীন ভারতীয় প্রেম কবিতারই ধারক। তাঁরা জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক নর-নারীর চেতন-অবচেতন প্রেমের গাঁথাই লিখেছেন। কিশোর কিশোরীর এই প্রেমেই বৈষ্ণব পদকর্তাদের

আধ্যাত্মসাধনার ভাবময় অবয়বকে রূপায়িত করেছে। যেখানে পদকর্তাদের অজ্ঞাতসারেই দাস্যভাবের স্ফূরণ ঘটেছে, যা চৈতন্যপূর্ববর্তী পদসাহিত্যে 'দাস্য' বিশ্বাসের স্বাক্ষর বহন করছে। তাই দেখা যায় বড়ুচণ্ডীদাসের রাধা বলছে–

"কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবো আপনা।।"[১৫]

রাধার দাসী হয়ে কৃষ্ণের পদে নিজেকে সমর্পণ দাসভাবনারই প্রতীক। যে দাস্যভাবনার আঁকরেই রয়েছে 'প্রভুর চরণ', রাধা এখানে প্রেয়সীরূপে প্রভুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইছে, যা সরাসরি দাসভাবনাকে সূচিত করে। পদাবলি সাহিত্যে এই 'চরণ'– প্রসঙ্গ বরাবরই আসতে দেখা গেছে, চৈতন্যপূর্ববর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম না। 'নিবেদন' পর্যায়ের চণ্ডীদাসের রাধা বলছে–

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি।।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।।"[১৬]

উক্ত পদে রাধার আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা স্পষ্ট। প্রেমের চরম পর্যায়ে এসে রাধা তার দেহ, মন, কুল, শীল, জাতি, মান সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণের চরণে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এখানে পাপ-পুণ্য রাধার কাছে দুইই সমান, কেননা শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলই তার কাছে সর্বস্ব। উদাহরণের মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট যে, প্রেমমনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপের বর্ণনার মধ্য দিয়ে বৈষ্ণবকবিরা অজান্তেই স্রষ্টার চরণে দাস্যভাবের স্ফূরণ ঘটিয়েছেন। তাই জনমে জনমে তাঁরা সেই স্রষ্টাকেই চাইছেন, সেই চরণই তাঁদের একমাত্র স্থান বলে নির্ণিত হোক একথা বারবারই প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এদিকে বিদ্যাপতি লিখেছেন–

"মাধব বহু মিনতি করি তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।।"[১৭]

কবির এই আত্মগত অনুভূতির মধ্যে ভক্তের ঐকান্তিক আত্মসমর্পণের সুর ধ্বনিত হয়েছে, যা দাস্যভাবকে সূচিত করে, এই তিল-তুলসী অর্পণ, প্রভুর চরণে প্রদান করা অর্ঘ্য প্রভুর জন্য করা ভক্তের কার্যকে নির্দিষ্ট করে, যা সরাসরি অর্থেই দাস্যভাবনার উপস্থিতিকে সূচিত করে।

বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যাপতি মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজসভার কবি, আর তিনি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' কাব্য লিখেছিলেন। কাজেই একথা স্বীকার্য যে তিনি বিশুদ্ধ বৈষ্ণব কবি ছিলেননা। অদ্বৈতের জীবনী

থেকে একথা আরোও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। সেখানে পাওয়া যায় যে, যখন অদ্বৈত দেখলেন গাছের নীচে বসে একজন রাধাকৃষ্ণের গানকীর্তন করছেন তখন তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে প্রত্যুত্তরে গায়ককবি বলেন–

"বিপ্র কহে দ্বিজ আমি নাম বিদ্যাপতি
রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়তে মতি।
বাতুলতা করি মুই রচিনু এই সংগীত।"

এখানে বিদ্যাপতির বাচনিক তিনি যে রাজসভার কবি, আর তিনি যে'বাতুলতা' করেই কৃষ্ণের পদ রচনা করেছেন একথা স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে বিদ্যাপতির উক্ত কথার উত্তরে অদ্বৈত মহাপ্রভু যা বললেন তা প্রণিধানযোগ্য–

"অপূর্ব রচিত এই তোমার সংগীত
মুই কোন ছাড় স্বয়ং কৃষ্ণ হয় আকর্ষিত।"

কাজেই রাজসভার কবি বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' লিখলেও, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবকবি না হলেও বাঙালিরা তাঁকে গ্রহণ করেছিল। উপরন্তু বিদ্যাপতির রচনা পরবর্তীকালে চৈতন্যকেও আকর্ষিত করেছিল এবং চৈতন্য তাঁকে আস্বাদন করেছিলেন। সেই বিদ্যাপতির পদেও সরাসরি দাস্যভাবনা ছিল। এর উদাহরণ তাঁর আরও কয়েকটি পদের মধ্য দিয়ে দেখানো যেতে পারে। 'প্রার্থনা' পর্যায়ে বিদ্যাপতির রাধা বলছে–

(i) "আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রঙ্গ রসে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা।"[১৮]

(ii) "এ হরি বন্দোঁ তুঅ পদ নায়
তুঅ পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি
পার হব কোন উপায়।।
জাবত জনম হম তুঅ পদ ন সেবিলুঁ
জুবতী মতিময় মেলি।"[১৯]

উক্ত পদদ্বয়ে'পদ' (চরণ অর্থে) এবং 'ভজনা' শব্দের ব্যবহার 'দাস্যভাবনাকে' সূচিত করে। এই পদগুলোতে রাধা আক্ষেপ করছে জীবনের অনেকগুলো সময় (শৈশব ও কৈশোরকাল) শ্রীকৃষ্ণের 'ভজনা' বিহীন, 'চরণবন্দনা' বিহীন বৃথা অপচয় করার জন্যে। পক্ষান্তরে এদিকটিও স্পষ্ট যে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা অর্থাৎ 'সেবা' (√ভজ জাত ভজনা যার অর্থ সেবা) করার স্পৃহা রাধার মনে সেইসময় জাগ্রত হয়েছে বলেই পূর্বেকার শ্রীকৃষ্ণের সেবাবিহিত সময়কে ধিক্কার জানাচ্ছে। রাধার এই স্বভাববৈচিত্র্য সরাসরি দাস্যভাবের অন্তর্গত।

তবে একথাও সত্য, প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণবপদাবলির এই 'দাস্যভাবনা', তা যে কোনো বিশেষ 'তত্ত্বের রস ভাষ্য' একথা ঠিক বলা যায়না, কেননা চৈতন্যপূর্ববর্তী পদগুলোতে কৃষ্ণের মাধুর্য এবং ঐশ্বর্যরূপের মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানা হয়নি, অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণ স্বয়ং নিজের ঐশ্বর্য রূপের কথা বলেছেন,

"তীন ভুবনে রাধা আহ্মে অধিকারী
বাছিআঁ সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী।।"[২০]

আবার,

"কংস বধিবারে মোএ কৈলোঁ অবতার
এবেঁ কি বহিব আহ্মে তোর দধিভার।।"[২১]

এখানে বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণ ত্রিভুবনের অধিকারী। এখানে তাঁর ঐশ্বর্যরূপ প্রতিফলিত। বলা প্রয়োজন যে ঈশ্বরকে ঐশ্বর্যময় করে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে মালাধর বসুর স্থান সর্বোপরি (গুণরাজ খান ছদ্মনামে)। তিনি যে ভাগবত অনুবাদ করে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' লিখেছেন, সেখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের প্রসঙ্গ বারবারই এসেছে, আর একথা অকপটে স্বীকার করা হয়েছে উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায়। ভূমিকাকার লিখেছেন–

"প্রাকচৈতন্য যুগের শ্রীকৃষ্ণ লীলা সাধনের দুইটি ধারা দেখা যায়, একটি ধারায় শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও ভগবত্তার উপর বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে। অপর ধারায় বৃন্দাবন লীলার অন্তর্গত শৃঙ্গার রসের বর্ণনা বেশি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়রামানন্দ প্রভৃতি শেষোক্তধারার কবি– ইহারা প্রধানতঃ বৃন্দাবনলীলার গোপীপ্রেমের বর্ণনাই করিয়াছেন। আর মালাধর এবং আরও অনেক কবি প্রথম ধারা অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যকে মুখ্য স্থান দিয়াছেন।"[২২]

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র প্রায়ভাগ স্থান জুড়েই রয়েছে যুদ্ধের বর্ণনা। যেখানে প্রবল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাভূত করছেন কৃষ্ণ, যা কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের ধারক। তাছাড়া "কবি ঐশ্বর্য বর্ণনা করতেই ভালোবাসেন বলিয়া উদ্ধব কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগবতে উদ্ধবের বিশ্বরূপ দর্শনের কথা নাই।"[২৩] ঈশ্বর যেখানে ঐশ্বর্যময়, যেখানে তিনি অনাদি-অনন্ত-সর্বশক্তিমান-ত্রিভুবনধারী সেখানে ভক্ত স্বভাবতই তাঁর চরণসেবায় নিমগ্ন থাকবে, অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা, যথার্থ অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ভক্তরা প্রভুর ঐশ্বর্যরূপকে সেবন করবে। তবে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র সঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র তুলনা করলে দেখা যায় 'একই বৃন্তে দুটি কুসুমের' মত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের সঙ্গে মাধুর্যরূপও এসেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণ যখন নিজের ঐশ্বর্যরূপের বর্ণনা করতে গিয়ে 'তিন ভুবনে আহ্মে অধিকারী', 'কংস বধিবারে কৈলোঁ অবতার' ইত্যাদি বলছেন তখন দুটি পংক্তিরই প্রথম সারিতে নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে উপস্থাপিত করলেও, পরের সারিতেই 'বাঁছিয়া সে পালি রাধা আহ্মাক ভারী', 'এঁবে কি বহিব আহ্মে তোর দধিভারে' ইত্যাদির উচ্চারণে তার মাধুর্যরূপেই উঠে এসেছে। এখানে প্রেমের কাছে নিজের ঐশ্বর্যকে বিকিয়ে দিলেন কৃষ্ণ, রাধার দধিভার তিনি স্বয়ং বহন করলেন। তিনি তো সর্বশক্তিমান, চাইলেই রাধার প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ নাকজ করতেই পারতেন, কিন্তু করলেন না। এখানে ভক্তের সেবায় ভগবান নিজেকে নিয়োজিত করলেন, যা 'প্রতিদাস্যভাবনাকে' সূচিত করে। এই'প্রতি দাস্যের' উদাহরণ জয়দেবেও পাওয়া যায়, তাঁর 'গীতগোবিন্দম্' গ্রন্থে। সেখানে দেখা গেছে রাধার (ভক্তের) মান ভাঙানোর জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ 'পা' ধরেছেন রাধার–

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহ পদপল্লবমুদারম্।"[২৪]

'হে কামবিষ বিনাশক আমার এই শিরোভূষণ তোমার ঐ পরম সুন্দর পদপল্লব আমার এই মস্তকে স্থাপন কর।'

অর্থাৎ বৈষ্ণবসাহিত্যের পূর্বসূরী বিলাসকলাধীন জয়দেবের কাব্যেও 'প্রতিদাস্যের' বীজ সুপ্তভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল; যেখানে ভগবান তাঁর মস্তক ভক্তচরণে স্থাপন করেছেন। কাজেই, প্রাকচৈতন্য যুগে যেখানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্যরূপের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানে মালাধর বসুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েও, একথা যেভাবে বলা যায় যে বড়ুচণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন), জয়দেব (গীতগোবিন্দম) ইত্যাদির কাব্যে অনেকাংশে ঐশ্বর্যভাব থাকলেও দাস্যরসের ক্ষীণধারা সেখানে এসেছে– তাই কাব্যের অনেক স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে 'জীবনসর্বস্ব' বলে গ্রহণ করা হয়েছে, সেভাবে ঐশ্বর্যরূপ বর্ণনায় পটিয়সী স্বয়ং মালাধর বসু পর্যন্ত এই ভাবনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেননি, তাঁর বিরচিত একটি লাইনই তাঁর দাস্যভাবনার প্রামাণিক স্থিতি বহন করছে, আর সেটি হচ্ছে–

"বাসুদেবসুত কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"[২৫]

'প্রাণনাথ' শব্দটি সাধারণত একজন স্ত্রী তার স্বামীর জন্যই উচ্চারণ করে থাকে। কাজেই এই উক্তি 'কান্তাভাবকে' সূচিত করে অর্থাৎ 'মধুররস'। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে'র ভূমিকাকার উক্ত পদটিকে মালাধরের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উক্তি বলে গ্রহণ করেছেন আর কবি মালাধরের এই সংলাপের প্রশংসা করে স্বয়ং চৈতন্যদেব কুলীনগ্রামবাসীদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন এই বলে–

"কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর
সেহো মোর প্রিয় অন্যজন বহুদূর"[২৬]

তাছাড়া চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে রায় রামানন্দের সঙ্গে বার্তালাপের সময় 'কান্তাভাবে' ভজনাকে 'সর্বসাধ্যসার' বলেছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম), যেখানে এসে দাস্যভাবনা প্রেমরসে মজে গিয়ে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে।

এই পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই প্রাকচৈতন্য যুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে দাস্যভাবের উপস্থিতির সঙ্গে জড়িত সকল দ্বৈতভাবের অবসান ঘটে, যেখানে ঈশ্বর ভক্তের প্রাণের সম্বল, ভগবানের কর্তৃত্বই ভক্তের পরিচয়, সেখানে 'দাস্যভক্তির' উপস্থিতিকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যায় না। যা চৈতন্যের পরবর্তীকালে আরও গাঢ়তর হয়।

● চৈতন্যপরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে দাস্যভাবনা

সেদিন বৈষ্ণবসমাজে চৈতন্যের জীবনের আদর্শে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন রূপ নিয়েছিল, সেখানে দাস্যভাবনাকেই চরম স্থান দেওয়া হয়েছিল। শঙ্করাচার্য যেখানে বলেছিলেন 'জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ'– জীব হচ্ছে স্বয়ং ব্রহ্ম সেখানে বৈষ্ণবরা ঘোষণা করলেন যে জীব হচ্ছে তাঁর 'তটস্থা' শক্তির অন্তর্গত এবং জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাসচ আর বাংলার সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্য জীবের এই চিরন্তন স্বরূপকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে এবং কবিরা সেই রচনাবলির মধ্য দিয়ে স্রষ্টার চরণে আত্মনিবেদনের সুর তুলেছেন। ফলে চৈতন্যের পূর্বে যে সাহিত্যধারা

(বৈষ্ণব সাহিত্য) লৌকিক আবর্তনে কিছুটা হালকা হয়ে গিয়েছিল, চৈতন্য-সংস্পর্শে এসে সেই 'সাধারণী রতি' কৃষ্ণরতিতে পরিণত হয়। ভক্তমণ্ডলের কাছে এই প্রাণপুরুষ ছিলেন সংকীর্তনের নির্যাস (বহিরঙ্গ) আবার তত্ত্বগত (গৌরতত্ত্ব) দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ–

"শ্রীরাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।"[২৭]

চৈতন্যাবির্ভাবের হেতু নির্ধারণে বাংলার মনীষীগণ প্রধানত দুটি কারণ দেখিয়েছেন যা রৈখিক চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে–

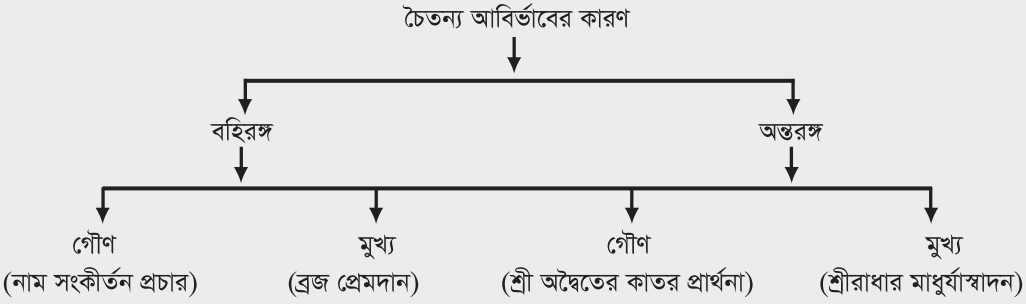

এখানে চৈতন্যাবির্ভাবের যে কয়টি কারণ দেখানো হয়েছে- অন্তরঙ্গ হোক অথবা বহিরঙ্গ সবকটিতেই দাস্যভাবের প্রক্ষেপ রয়েছে, এর বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে একথা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। তাই'বহিরঙ্গের' অন্তর্গত কারণগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

গৌণ কারণ (নাম সংকীর্তন প্রচার)

'জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস' একথা সামনে রেখেই জীবের কৃষ্ণনাম গ্রহণের নির্দেশ রয়েছে তাই চৈতন্যচরিতামৃতে দেখা গেছে নামসংকীর্তন শ্রবণমাত্রই সকলে আত্মাভিমান বিসর্জন দিয়ে প্রেমাবেশে চৈতন্যের সঙ্গে কীর্তনে যোগদান করেছেন।[২৮]

মুখ্যকারণ (ব্রজ প্রেমদান)

ব্রজপ্রেমের মুখ্য ভিত্তিই হচ্ছে 'আত্মসমর্পণ'। রাধার মাধুর্য আস্বাদনে যে প্রেম রয়েছে, যে প্রেমের বর্ণনা রয়েছে 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে, 'চৈতন্যচরিতামৃতে' যে প্রেমের কথা বলা হয়েছে, যেখানে প্রেমিক নিজেকে ভুলে গিয়ে কেবল প্রেমাস্পদের সুখ কামনা করে, এর মধ্যে যে আত্মলুপ্তির ভাব ফুটে উঠে, তাই 'দাস্যপ্রেমের' অন্তর্গত।

'অন্তরঙ্গ' কারণের দুটি বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়–

গৌণ কারণ (শ্রী অদ্বৈতের কাতর প্রার্থনা)

এই প্রার্থনার মূলেও রয়েছে 'দাস্যভাবনা'। কারণ অদ্বৈত যখন গঙ্গাজল এবং তুলসিকে সাক্ষী করে ঈশ্বরকে হুংকার জানিয়েছেন যে, 'হে প্রভু তোমাকে আসতেই হবে'। এই যে জোর কোনো ঐশ্বর্যে বলীয়ান ভক্তের জোর

না, এ হচ্ছে দাসের ভক্তির জোর। তবে একথাও সত্য যে সেই সর্বশক্তিমান প্রভুর উপর এক ভৃত্যের জোর খাটানো কখনোই সম্ভব না, এখানেই কৃষ্ণের মাধুর্যরূপের স্থাপত্য, এখানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিশিষ্টতা ধরা পড়ে। একমাত্র প্রকৃত দাসই তার প্রভুকে, এক সখা তার সখাকে, এক প্রেমিকা তার প্রেমিককে জোর দেখাতে পারে। এখানেই দাসের প্রেমের ব্যাপ্তি। তাছাড়া আরেকটি দিক এই যে অদ্বৈত সেই ঈশ্বরকে আসার জন্য যে হুংকার দিয়েছেন তা নিজের জন্য নয়, তিনি ঈশ্বরকে ডেকেছেন, ধরাতলে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বিপথগামী জনগণকে উদ্ধারের জন্য।[২৯] অদ্বৈতের স্বার্থত্যাগী এই কাজের ভিত্তিতেও 'দাস্যভাবনার' উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়, কারণ আত্মবিলুপ্তিই হচ্ছে দাস্যের মূল লক্ষণ।

মুখ্য কারণ (শ্রীরাধার মাধুর্যাস্বাদন)

এই রাধার মাধুর্যাস্বাদনেও রয়েছে দাস্যভাব। যার জন্য জয়দেবে আমরা দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ রাধার মান ভাঙাতে তার পায়ে নিজের মাথা ঠেকাচ্ছেন। এখানে 'প্রতিদাস্যের' ভাব পরিস্ফুট একথা আগেও বলা হয়েছে। তাছাড়া রাধাও প্রেমাবেশে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করেছে, এমনকি নিজের দেহ দিয়েও রাধা কৃষ্ণের সেবা করতে প্রস্তুত ছিল। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বলছে "কেঙ্কর্যমপি সর্বথা"[৩০] অর্থাৎ 'আমি সর্বতোভাবে তাহার সেবক'। সর্বাবস্থায় সর্বস্ব দিয়ে তাঁর সেবা, রাধার এই অবস্থান সরাসরি 'দাস্যভাবের' অন্তর্গত।

অতএব, বোঝাই যাচ্ছে যে চৈতন্যজীবনকে কেন্দ্র করে, তাঁর প্রবর্তিত ভক্তিভাবের সরল ব্যাখ্যায় বাংলাসাহিত্যে সেদিন দেখা গিয়েছিল কৃষ্ণসেবার প্লাবিত রূপ। চৈতন্যদেবের জীবন ও তাঁকে নিয়ে রচিত জীবনীসাহিত্যের মধ্যে সেদিন 'দাস্যভক্তির' প্রত্যক্ষ রূপটি প্রদর্শিত হয়েছিল।

চৈতন্যজীবনের ধারাবাহিকতার ক্রমপর্যায় অনুসৃত করলে দেখা যায় যে চৈতন্যদেব 'দাস্যভাব'কে স্বীকার করেছেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতের' সাধ্যসাধনতত্ত্ব নামক অধ্যায়ে রায়রামানন্দের সঙ্গে কথোপকথনকালে চৈতন্য 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'কে 'এহোবাহ্য'[৩১] বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, এর পেছনেও রয়েছে দাস্যভাবনারই প্রক্ষেপ। কারণ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শঙ্করাচার্য তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে 'জীব স্বয়ং ব্রহ্ম'[৩২] এই আত্মস্বরূপের অনুসন্ধানকে 'ভক্তি' বলে উল্লেখ করেছেন যা সম্পূর্ণই 'বৈষ্ণববিরোধী'। 'জীবের স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্যদাস' এই মতকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে শঙ্করাচার্যের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। তাই চৈতন্যদেব এর স্বীকৃতি দেননি।

পরবর্তীতে রায়রামানন্দ দাস্যপ্রেমকে 'সর্বসাধ্যসার' বলে উল্লেখ করলে চৈতন্যদেব এর প্রত্যুত্তরে 'এহোহয়'[৩৩] বলেছেন। জীবের যে নিত্যস্বরূপ, নিত্যদাসত্ব এখানে স্বীকৃতি পেয়েছে যদিও একেই চরম বলে তিনি গ্রহণ করেননি এবং এই দাস্যভাবকে অতিক্রম করে 'কান্তাপ্রেমকেই'[৩৪] চৈতন্য শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন যা মধুররসের ঘনীভূত রূপ। 'দাস্যভাবে' জীবের পুরোপুরি আত্মসমর্পণ হয়না, 'আমি দাস' এই আমিত্ববোধে অহং ভাবটুকু থেকে যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তের রতি পাঁচটি– শ্রম, সেবা, বিশ্বাস লাল্যপাল্যভাব আর মধুরা। যা ক্রমে পাঁচটি রসের নিষ্পত্তি ঘটায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আলংকারিকদের মতে "মনের সুখকর প্রিয় বস্তুতে চিত্তের যে অনুরাগ তাহাই রতি।"[৩৫] এর ঘনীভূত অবস্থা হচ্ছে প্রেম। তাই যেখানে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন ঘটে না, কারণ 'সম্পর্কানুগা' প্রেমের হাত ধরে অহং এর স্পর্শ

এখানে থেকে যায়; সেখানে মধুররসের অন্তর্গত অহং বিবর্জিত 'কান্তাপ্রেম' হচ্ছে 'প্রেমানুগা'– যা সেবাবাসনার সর্বোৎকৃষ্ট পথ। এখানে প্রেমিকা যেমন করেই হোক এমনকি নিজ অঙ্গ দিয়ে সেবা করে হলেও শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করে, যে সাধনার ঋণ পরিশোধনে স্বয়ং কৃষ্ণও অসমর্থ।[৩৬] শ্রীরূপ গোস্বামীও সকল বাসনা বর্জনপূর্বক কৃষ্ণসেবাকেই উত্তমাভক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন–

"ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ু র্হরেরেব সমর্পয়ান্তি।।"[৩৭]
'কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কার্য্যে কালহরণ না করা অব্যর্থকালত্ব।'

এই একই ভাবনার অনুরণন শোনা গেছে 'চৈতন্যভাগবতে'। সেখানে বলা হয়েছে–

"তোমা না জানিয়া যে শিবাদি দেব ভজে
বৃক্ষমূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে।"[৩৮]

একমাত্র কৃষ্ণকে আরাধ্য বলে গ্রহণ করে, একমাত্র তাঁর চরণসেবায় ব্রতী হওয়া, বৈষ্ণবীয় বিশ্বাসের এই বীজ বপন করা হয়েছিল সেই 'ভাগবতে'ই সেখানে স্পষ্টত বলা হয়েছিল–

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যান্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।"[৩৯]

'যেমন বৃক্ষমূলে জলসেচন করলে তার কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা প্রভৃতির পুষ্টিসাধন হয় এবং যেমন ভোজনের দ্বারা প্রাণসমূহের তৃপ্তিবিধান করলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই পরিপুষ্টি লাভ করে, ঠিক সেরকমই একমাত্র ঈশ্বরের পূজা দ্বারা সকলেরই পূজা হয়।'

এখানে একমাত্র ঈশ্বর অর্থাৎ একেশ্বরবাদের ধারণাই স্পষ্ট। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ভজনা বা সেবার কথা বলা হয়েছে। বৈষ্ণব কবি শ্রীমন্ত শংকরদেব এই একই বিশ্বাসের ঘোষণা করলেন এভাবে–

"অন্য দেবী দের ন করিবা সেবা
ন খাইবা প্রসাদ তার।
মূত্তিকো ন চাইবা গৃহো ন পশিবা
ভক্তি হৈব ব্যাভিচার।"[৪০]

জীবনের প্রতিটি কার্য কৃষ্ণের সেবার অনুগামী, এই একমাত্র কর্মের দ্বারা ভক্তের জীবনের প্রতিটি ক্ষণের সদোপ্রয়োগ হয়েছে বলে মনে করার এই প্রবণতাই হচ্ছে দাস্যপ্রেম, দাস্যভক্তি। রূপ গোস্বামী তাই এই একমাত্র কৃষ্ণের সেবাকেই শ্রেষ্ঠ কর্ম বলে বিবেচনা করেছেন তাঁর'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' গ্রন্থে–

"মুহূর্ত্তং বা মুহূর্তার্দ্ধং যস্তিষ্ঠেদ্ধরিমন্দিরে
স যাতি পরমং স্থানং কিমূ শুশূষণে রতা।"[৪১]

'যিনি মুহূর্ত বা অর্ধমুহূর্তকাল হরিমন্দিরে অবস্থিতি করেন, তিনি হরির পরম ধাম প্রাপ্ত হন, আর যাঁহারা তাঁহার সেবায় রত, তাহাদের ত কথাই নাই।'

বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে কৃষ্ণসেবাবাসনাকে 'উত্তমাভক্তি' বলে ধার্য করা হয়েছে। কৃষ্ণ-সেবকদের, প্রকৃত দাস্যভক্তের ইহকাল বা পরকাল কোনোকালেরই চিন্তা করতে হয় না। কারণ কৃষ্ণ নিজেই বলেছেন–

"মম নাম সদাগ্রাহী মম সেবা প্রিয়ঃ সদা
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তিঃ কদাচন।।"[৪২]

'যে ব্যক্তি সর্বদা আমার সেবাতে প্রীতি সম্পন্ন হইয়া নিরন্তর আমার নাম গ্রহণ করে, তাহাকে আমি ভক্তিই দিব কখনও (ভক্তিশূন্যা) মুক্তি দেব না।'

আসলে দাস্যভক্তের মুক্তিকাম্যই না, সে চায় চিরদাসত্ব, তাই ভগবানও সেই দাসের ভক্তিবৎসলতায় বাঁধা পড়েন, তাই তাকে স্বয়ং ভগবানও মুক্তির পরিবর্তে চিরন্তন ভক্তিই প্রদান করেন। তার আত্মনিয়োগকে আরও গাঢ়তর করে তোলেন। এদিকটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রহ্লাদের প্রার্থনার মধ্য দিয়ে-

"নাথ জন্ম সহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম।
তেষু তেষবচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি।।"[৪৩]

'হে নাথ আমি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করলেও তোমার প্রতি আমার নিরন্তর ভক্তি যেন অটুট থাকে।'

দেখা গেছে যে ভক্ত এবং স্বয়ং ঈশ্বর 'দাস্যভাবনায়' কেউই কাউকে মুক্তি দিতে চান না। ভক্ত যেমন মুক্তি কামনা করে না জন্মে জন্মে কেবল দাসই থাকতে চায়, তেমনি ঈশ্বরও তাঁর দাসের সংস্পর্শেই থাকতে চান, দাস্যভক্তকে মুক্তি দেন না। তাই দেখা গেছে যে সার্বভৌমের সঙ্গে কথোপকথনকালে চৈতন্যদেব বলেছিলেন–

"মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় উল্লাস।।"[৪৪]

ঈশ্বরসাধনার পথে ভক্তের পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় তার নিত্যদাসত্ব। তাই কৃষ্ণসেবক কৃষ্ণের সঙ্গে একত্বপ্রাপ্তি কিংবা মোক্ষবাঞ্ছা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণসেবার মাধ্যমেই জীবন অতিবাহিত করতে চায়।

তবে গৌড়ীয় মতে মোক্ষকামী পুরুষদের সাধনাও দাসভাবনা বিবর্জিত না, এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে যে মুক্তি পাঁচ প্রকার– 'সালোক্য', 'সামীপ্য', 'সারূপ্য', 'সার্ষ্টি', 'সাযুজ্য'। ভক্ত বিশ্বাসের মুক্তি কামনায় স্তর পৃথক। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সমলোকে অবস্থান করা হলে 'সালোক্য'। সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকা বা ঈশ্বর সমীপে থাকা হলে 'সামীপ্য', সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে সমগতি প্রাপ্তি বা সমরিষ্টি প্রাপ্তির নাম 'সার্ষ্টি'। পঞ্চমুক্তির মধ্যে প্রথম চারটিতে সেবার সুযোগ থাকে। সেখানে ভক্ত দাসের পথ অঙ্গীকার করতেও পারে।

"সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্য আর
সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার।।

তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার।।
সালোক্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।।"[৪৫]

কারণ মোক্ষবাঞ্ছার চতুর্থস্তর পর্যন্ত ভক্তের স্থান প্রভুর নীচেই থাকে। তবে 'সাযুজ্য' মুক্তি অর্থাৎ যেখানে ভক্ত ঈশ্বরের এক দেহপ্রাপ্তি কামনা করে সেখানে দ্যস্যভাবের স্থান থাকে না। আর দাস্যরসে ঈশ্বরের সঙ্গে 'একদেহিত্ব' প্রাপ্তি কখনোই কাঙ্ক্ষিত না। দাস্যসেবায় ভক্ত নরক পর্যন্ত কামনা করতে কুণ্ঠিত হয় না বরং ঈশ্বরের স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষায় তার ঘৃণার উদ্রেক হয়। এই ভাবনায় দাসের একমাত্র সাধ–

"হরি হেন দিন হইবে আমার
দুহুঁ অঙ্গ পরশিব দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব
সেবন করিব দোঁহাকারে।।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে।।"[৪৬]

অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি, মোক্ষলাভ, অর্থ, যশ, সাহচর্য, কলা-কৃষ্টি ইত্যাদি পার্থিব জগতের কিছুই তার কাম্য না, জন্ম-জন্মান্তরে অহৈতুকী শ্রদ্ধা-ভক্তিই শুধু তার কাম্য। এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে চৈতন্যের শেষ জীবনে রচিত আটটি শ্লোকের মধ্যে অন্যতম চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্লোকে।

(চতুর্থ শ্লোক)

"ন ধনং ন জনং সুন্দরীং
কবিতা বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মানি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি।।"[৪৭]

'হে জগদীশ, আমি তোমার নিকট থেকে ধন, সুন্দরী, নারী বা কবিতা চাইনা। তোমার প্রতি যেন জন্ম-জন্মান্তরে আমার অহৈতুকী শ্রদ্ধা ভক্তি এই আমার কাম্য।'

যে ভক্তিতে হেতু থাকে তা 'কৈতবভক্তি'। ধন, জন, যশ, মোক্ষলাভ ইত্যাদি এগুলো বৈষ্ণবীয় দর্শন অনুযায়ী 'কৈতবভক্তি'। যে ভক্তিতে আত্মনিবেদনের কোনো হেতু থাকে না, জন্ম-জন্মান্তরে কৃষ্ণচরণ সেবায় বিভোর হয়ে থাকতে চায়। তাই হচ্ছে 'অকৈতবভক্তি'। এখানে প্রেমের গাঢ়তা ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণচরণের সেবা ভিন্ন আর কিছুই কামনা করে না, আর 'সেবক' অথবা 'দাস' হিসেবে নিজের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না বরং এই পরিচয় তার কাছে অত্যন্ত সম্মানের। তাই চৈতন্যদেবও নিজেকে কৃষ্ণের কিঙ্কর হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন–

(পঞ্চম শ্লোক)

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বধৌ।।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়।।"[৪৮]

'হে নন্দ নন্দন, বিষয় সংসার সমুদ্রে পতিত তোমার কিঙ্কর এই আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীতুল্য মনে কর।'

জীব মাত্রই কৃষ্ণের দাস, তা ভুলে চৈতন্য মহাপ্রভু সংসার সমুদ্রে মায়াবশ হয়ে বসে রয়েছেন। তাই অত্যন্ত দৈন্যের সঙ্গে তিনি কৃষ্ণচরণে দাস্যভক্তির প্রার্থনা করে, কৃষ্ণ চরণতলে ধূলি হয়ে সর্বদা কৃষ্ণের সেবা করে কৃতার্থ হতে চেয়েছেন।

অতএব, একথা সহজেই অনুমেয় যে যেখানে পৌরাণিক যুগে মুক্তি তথা স্বর্গলাভের আশায় চারিত্রিক গুণাবলি রক্ষার্থে কৃষ্ণচরণে নিষ্ঠা তথা যাগযোজ্ঞাদির প্রচলন ছিল, ভারতের ভক্তি আন্দোলনে উত্তাল তরঙ্গে এই আচারকেন্দ্রিক যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি নিষ্প্রভ হয়ে দাঁড়াল তখন ভক্তচোখে মায়াময় জগৎ হয়ে দাঁড়ায় লীলাময় এবং নির্বাণের বিপরীতে তারা চাইল লীলারসের আস্বাদন। সঙ্গে 'নামমাহাত্ম' প্রাধান্য পেল আর ভক্তের স্বরূপ হল নিত্যদাস। তবে একথা স্বীকার করা প্রয়োজন 'নামমাহাত্ম্যের' কথা 'গীতা'তেও রয়েছে, সেখানে যজ্ঞের মহিমাকে অক্ষুণ্ন রেখে হলেও জপমাহাত্ম্যকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল–

"মহর্ষিণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞেহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।।"[৪৯]

"মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে এক অক্ষর ওঁকার, যজ্ঞসকলের মধ্যে জপরূপ যজ্ঞ, স্থাবর সকলের মধ্যে আমিই হিমালয়।"

বোঝাই যাচ্ছে যে, জপের মাহাত্ম্য প্রাচীন যুগেও অব্যাহত ছিল। তবে তা ছিল আচার কেন্দ্রিক, অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। কিন্তু ভক্তি আন্দোলনের স্রোতে আগত 'নামমাহাত্ম্য' বাহ্যিক দৃষ্টিতে ছিল 'প্রচারকেন্দ্রিক' আর আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে ছিল 'দাসের আর্তি'। এখানে এসেই দাস্যভাবনা এক তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণে পরিণত হয় যা বৈষ্ণবীয় দর্শনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। যার ক্রমবিবর্তনকে নিম্নোক্ত উদাহরণ সহযোগে দেখানো যেতে পারে।

ভক্তকবিদের সাহিত্যে দাসভাবনা

গৌড়ীয়বৈষ্ণব মতে পঞ্চরসের মূল স্বরূপই হচ্ছে ভক্তিরস, যা মধুররসে পরিপূর্ণতা পায়। লক্ষণীয় যে গোবিন্দদাস একটি কীর্তনের পদে নববিধ ভক্তির কথা উল্লেখ করেন, তার মধ্যে দাস্যভক্তি অন্যতম–

" শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাসি রে

পূজন সখিজন আত্ম নিবেদন
গোবিন্দদাস অভিলাষিরে।।"[৫০]

গোবিন্দদাস একটি কীর্তনের পদে 'ভাগবতে'র স্কন্ধের (৭/৫/২৩) নং শ্লোকানুসরণে নববিধা ভক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে 'পাদসেবন', 'আত্মনিবেদন' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারের ফলে একথা স্পষ্ট করে যে গোবিন্দদাস 'দাস্যভক্তিকে' এক বিশেষ স্থান দিয়েছেন। এভাবে চৈতন্যপরবর্তী আরও অন্যান্য বৈষ্ণবকবিদেরও লেখনীমুখে দাসভাবনার প্রত্যক্ষ অনুরণন ঘটেছে। নরোত্তম দাসের একটি সুপ্রসিদ্ধ পদ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন–

"প্রিয় সখীগণ সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে
চরণ সেবিব নিজ করে।
দুহুঁক কমলদিঠি কৌতুকে হেরব
দুহুঁ অঙ্গ পুলকঅঙ্কুরে।।"[৫১]

চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগে অঙ্গের অথবা দেহের কথা এসেছে কামনাসিদ্ধির অন্যতম উপায় হিসেবে। কিন্তু চৈতন্য পরবর্তীযুগে 'দেহকে' কৃষ্ণোন্মুখ করে ভক্তির পরাকাষ্ঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, লক্ষণীয় যে চৈতন্যদেব 'রাধাভাবকে' শ্রেষ্ঠ বলেছেন, যদিও রাধা গোপীদের মধ্যে অন্যতমা তবু অসমের শ্রীমন্ত শংকরদেব 'রাধাভাবকে' শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেননি, গোপীভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন। তবে চৈতন্যদেবের কথা মেনে নিয়ে একথা বলাই যায় যে নিখিল ভক্তের সর্বোৎকৃষ্ট পথিক মধুর ভাবের প্রধান আশ্রয় শ্রীরাধা। তবে "সখিবিনে নহে এই লীলা।"[৫২] সখিহীন রাধাকৃষ্ণ প্রেম বৈচিত্রহীন প্রেমমাত্র লীলা নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধকগণ গোপীভাবকেই শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেছেন এবং গোপীদের পাদবন্দনাও করেছেন এর প্রমাণ 'ভাগবত' বহন করছে। অর্থাৎ গৌড়ীয়বৈষ্ণব সাধকগণের মধ্যে 'দাসেরও দাস' এই বিশ্বাসের অবস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা দাস্যভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে একথাও স্বীকার করে যে কৃষ্ণের সেবকদেরও এক উচ্চ মর্যাদা রয়েছে, তাই বৈষ্ণবকবিরা কৃষ্ণের নাহলেও কৃষ্ণদাসেরও যদি দাস হতে পারেন তাতেই তাঁরা সুখী। আর 'দাসেরও দাস' হওয়ার প্রার্থনাকে তারা স্বীকৃতিও দিয়েছেন বিভিন্নভাবে। ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা অসম প্রদেশের শ্রীমন্ত শংকরদেব এই একইভাবে 'দাসেরও দাস' হওয়ার ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন এভাবে–

"কর প্রভু দয়া জন্মে জন্মে হৈবো
তোমার দাসের দাস।"[৫৩]

অতএব, একথা প্রমাণিত যে দাস ভাবনার প্রক্ষেপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তার লাভ করেছিল আর তার স্বাক্ষর বৈষ্ণবসাহিত্য আজও বহন করে চলেছে।

চৈতন্য পরবর্তী সাহিত্যের অন্যতম সৃষ্টি হচ্ছে 'বাৎসল্য' রসের পদ। এই বাৎসল্য রসের পদের ভিত্তিতেই কবিরা আত্মনিয়োগ করে নিজের সেবাবাসনার পূর্তি ঘটিয়েছেন। এরমধ্যে যাদবেন্দ্র ও বলরামের পদসমূহ অন্যতম–

(i) মা যশোদার নানান বিপদের আশঙ্কা বাল্যকৃষ্ণের গোচারণ যাত্রা নিয়ে, তাই কবি নিজে যুক্ত হয়েছেন সেই যাত্রায় কৃষ্ণের পাদুকাযুগল নিয়ে–

"বলরাম দাসের বাণী শুনো ওগো নন্দরানী
মনে কিছু নাভাবিও ভয়।
চরণের বাধা লৈয়া দিব আমি যোগাইয়া
তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়।।"[৫৪]
(বলরাম দাস)

(ii) যাদবেন্দ্রের একটি পদে মায়ের উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে এভাবে–

"থাকিহ তরুরছায় মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগায় গায়
যাদবেন্দ্র সঙ্গে লইও বাধা পানই কাছে থুইও
বুঝিয়া যোগাইবে রাঙ্গা পায়।।"[৫৫]

এখানে বাৎসল্য রস দাস্যরসে লীন হয়ে গেছে। উল্লেখিত পদসমূহে মায়ের আকুলতা ও উদ্বেগের চিত্র অতি স্পষ্ট, সঙ্গে দেখা যাচ্ছে পদকর্তারা নিজেরাই গোপালের পাদুকা যুগিয়ে দিচ্ছেন। কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষ্ণসেবায় তাঁদের নিজেদের নিয়োগের আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করতে পারেননি, তাই গোপালের পাদুকাদি সঙ্গে রেখেছেন। প্রয়োজন হলেই গোপালের রাঙা পায়ে যেন তার জোগান দিতে পারেন। তাঁরা গোপালের চরণের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই গোপালের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, যা চরণসেবারই দ্যোতক। এই বাৎসল্যরসের পদ ছাড়াও বৈষ্ণব কবিদের এমন কিছু পদও পাওয়া যায় যা সরাসরি দাস্যরসের ব্যপ্তিকে স্বীকার করে। তাই বলা যায় দাস্যপ্রেমের বশেই এই পদগুলো রচিত হয়েছে। যেমন–

(i) "চন্দন কুঙ্কুমে তিলক বনাইব
হেরব মুখ-সুধাকর।।
নীলপীতাম্বর যতনে পরাইব
পায়ে দিব রতন মঞ্জীরে।।"[৫৬]

(ii) "সুগন্ধিত চন্দন মণিময় আভরণ
কৌষিক বসন নানা রঙ্গে।
এই সব সেবা যার দাসী যেন হও তার
অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে।।"[৫৭]

উল্লেখিত প্রথম পদটিতে কবি সরাসরি কৃষ্ণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাইছেন, ঈশ্বরকে নানা ভূষণাদির দ্বারা সুসজ্জিত করতে চাইছেন, এমনকি 'রতন মঞ্জীরে' পরিয়ে কৃষ্ণের 'পায়ের' শোভা বর্ধিত করার

ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন– তা যে সম্পূর্ণভাবেই দাসভাবনাধীন একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর দ্বিতীয় পদটিতে যে 'তাঁর' সেবায় নিমজ্জিত সেই সেবকের দাস হতে চাইছেন এবং তার (ভক্তের) সেবার মাধুর্যকে, তার সাঙ্গ দ্বারা সেবন করতে চাইছেন অর্থাৎ কৃষ্ণের সেবকের সেবায় ব্রতী হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সে অর্থে দুটোই সরাসরি দাসভাবনার রূপচিত্রণের দৃষ্টান্ত একথা সহজেই বলা যায়। এভাবেই বৈষ্ণবকবিরা সেদিন নিজেকে সেবক রূপে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন আর নিজ পদাবলির স্ফুরণে সেই মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

রাধার দাস্যভাবনা

গোপীদের মধ্যে অন্যতম রাধা। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি রাধাভাবের আনুগত্যময়ী। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' রায়রামানন্দ বলেছেন–

"ইহার মধ্যে রাধাপ্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি।"[৫৮]

রাধাভাবের এই শ্রেষ্ঠত্ব 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থেও বারেবারেই স্বীকৃতি পেয়েছে–

"সর্ব্বথৈবাসসোর্দ্ধা যা সা স্যাদাত্যন্তিকাধিকা
সা রাধা সাতু মধ্যৈব যন্নান্যা সদৃশী ব্রজে"[৫৯]
ইত্যাদি শ্লোকে..

'যাহার সর্ব্বতোভাবে সম অথবা অধিক কেহ নাই তাহাকে আত্যন্তিকাধিকা কহে। শ্রীরাধাই আত্যন্তিকাধিকা, শ্রীরাধাই মধ্যা যেহেতু ব্রজ মধ্যে তাঁহার সদৃশী অন্য কোন গোপাঙ্গনা প্রধানা নাই অতএব শ্রীরাধাই সর্বপ্রধানা'।

আগেই বলা হয়েছে যে মধুর রসে সেবাভাবনা থাকবেই। তাই রাধার প্রেম যে দাস্যভাবনাধীন একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া তার (রাধার) প্রেমে সর্বস্ব ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের চরণে নিজের পরিচয় পর্যন্ত বিলীন করে দিয়েছে। প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে শ্রীরাধা কেবল কৃষ্ণচরণ কামনা করেছে। রাধা বলছে–

"বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি ওদুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে।।"[৬০]

কৃষ্ণকে ভালোবেসে রাধা নিজেই মহিমান্বিত, তাতেই রাধার তৃপ্তি, রাধার রূপলাবণ্যও সেই ভালোবাসারই অর্ঘ্যস্বরূপ। প্রেমের গোঁড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে যখন ভক্তরূপ প্রেমিকের আত্মবিলুপ্তি ঘটে তখনই সকল দ্বৈতভাবনার অবসান ঘটে এবং দাস্যভাবনা পরিপক্কতা লাভ করে। 'উজ্জ্বলনীলমণিতে' রাধাপ্রেমের এদিকটি স্বয়ং কৃষ্ণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে এভাবে–

শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলেছেন,

"কর্ত্তুং শর্ম্ম ক্ষণিকমপি মে সাধ্যমুজ্ঝতাশেষং
চিত্তোৎসঙ্গে ন ভজতি ময়া দত্তখেদাপ্যসূয়াং।
শ্রুত্বা চান্তর্ব্বিদলতি মৃষাপ্যার্ত্তিবার্ত্তালবং মে
রাধা মূর্দ্ধিন্যখিল সুদৃশাং রাজতে সদ্গুণেন।।"[৬১]

'আমার প্রতি শ্রীরাধার কি আশ্চর্য প্রীতি নিমিত্ত যদি আপনার অখিল ব্যবহার্য কার্য বিসর্জন দিতে হয়, তাহাও করিয়া থাকেন আমি তাহাকে খেদান নিতা করিলে তাহার মধ্যে পশু আর উদ্গম হয়না আর যদি কেহ তাহার অগ্রে মিথ্যা করিয়া আমার কিঞ্চিত মাত্র বিড়াল কথা বলে তাহাতেও তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, অতএব হে বন্ধো এই সকল গুণী শ্রীরাধা মৃগাক্ষী সকলের প্রতি অত্যর্থ বিরাজ করিতেছেন।'

সব ক্ষোভ, অভিমানের বিসর্জনপূর্বক সেই প্রেমাস্পদের সুখ কামনাই যার একমাত্র অভিপ্রায় সে দাস্যপ্রেমিকেরই মূর্ত বিগ্রহ, দাস যেমন সমস্ত পরিহার পূর্বক একমাত্র কৃষ্ণ সেবায় ব্রতী হতে চায়, তেমনি শ্রীরাধাও একমাত্র তাঁর সুখকামনায় নিজের অথবা অন্যের সমস্ত কর্মকে নাকজ করতে প্রস্তুত, কারণ কৃষ্ণকে সুখী করা ভিন্ন আর কিছুই কাম্যই নয় তার, এই বিশেষত্ব দাস্যভক্তির তথা দাস্যপ্রেমের অধীন। দাস্যপ্রেমের এই পথে আত্মমর্যাদার অবলুপ্তি ঘটে আর দাস্য পথগামী রাধা কেবলই বলে–

"তুমি সব জান কানুর পিরীতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন
তাহারে সঁপিয়াছি।।"[৬২]

দাস্যভাবনায় সব কিছুর বিনিময়ে হলেও দাস তাঁর দাসত্ব রক্ষা করতে চায় এখানে রাধা সবকিছু পরিহারপূর্বক নিজের প্রেমকে রক্ষা করতে চাইছে, এখানে 'সমর্পণ' প্রধান হয়ে উঠেছে, এজন্য রাধা (ভক্ত) পদটিতে সরাসরি 'দাস্যরসের' অধীন একথা তো বলা যায়ই উপরন্তু রাধা এখানে কান্তাভাবের অধীন এদিকটিও যদি প্রর্দশিত করা হয় তাহলেও যে সে 'দাস্যরস' বহির্ভূত না একথা প্রমাণিত হয় এভাবে–

"মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচে লালন মমতাধিক হয়।।
কান্তাভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চগুণ।।"[৬৩]

রাধাভাবের মধ্যে যে ব্যাকুলতা রয়েছে তার সূচনা 'দাস্য', 'সখ্য' এবং 'বাৎসল্যের' ভিতর দিয়ে চরম পরিণতি 'মধুরে'।'মধুররস' তিন 'রতি' দ্বারা জাত 'সাধারণী', 'সমঞ্জসা', 'সমর্থা'। 'সাধারণী' রতি হচ্ছে 'দর্শন জাত' এবং 'সম্ভোগা'ন্তে এর ইতি ঘটে। এর স্থায়িত্বও কম। 'সমঞ্জসা' রতি হচ্ছে গুণাদি শ্রবণজাত আর

'সম্পর্কানুগা'। এই রতি জাত প্রেম ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা তথা পরিণয় বন্ধনের পারস্পরিক সুখ চায়। তবে 'সমর্থা' রতিতে ভগবানের তৃপ্তি সাধনই একমাত্র লক্ষ্য। গুণ, রূপ কিছুই না কেবল 'কৃষ্ণ' বিষয়ক কোনো এক ধ্বনিই যেখানে আত্মহারা করে দেয়, সেখানে দাঁড়িয়েই চণ্ডীদাসের 'রাধা' গেয়েছিল "সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম/কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো আকুল করিল মোর পরাণ।" 'সমর্থা' রতিতে সংসার সমাজ সব মিথ্যা শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র সত্য হয়ে দাঁড়ায়, তাঁর অবিহনে ভক্ত কেবল মৃত্যু কামনা করে। নিবেদন পর্যায়ের রাধার যে দিব্যোন্মাদনার প্রকাশ পেয়েছে তা 'সমর্থা' রতি জাত প্রেম। এই পর্যায়ে এসে প্রেমাস্পদ ব্যতীত মৃত্যুই শ্রেয় বলে মনে হয় জ্ঞানদাসের পথগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়–

১) "মনের যে দুখ মোর মনেতে রইল।
ফুটিল শ্যামের সেল বাহির নহিল।।
নিশ্চয় মরিম সখি তারে না দেখিয়া
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া।।"[৬৪]

২) "মনের মর্মকথা শুনিলো সজনি
শ্যামবন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী।।
চিতের আগুন কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব।।"[৬৫]

কৃষ্ণই রাধার একমাত্র জীবন সম্বল। কৃষ্ণবিনে এই জীবন অসাড়। যেখানে কৃষ্ণের অদর্শনে মৃত্যু কাম্য, যেখানে জীবনের প্রতিটি ক্ষণ কৃষ্ণের জন্য অতিবাহিত সেখানে কৃষ্ণের অবর্তমানে আত্মহননের পথ অবলম্বন তাও কৃষ্ণকেন্দ্রিক হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই মৃত্যুর পরও রাধা কৃষ্ণের সাহচর্য কামনা করে। মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হলে কৃষ্ণের সঙ্গসুখ লাভ হবে না। তাই রাধা সখীদের বলছে–

"মরিলে তোরা করবি এক কাজে।
আমায় নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি,
রাখবি তনু এই ব্রজমাঝে।
হামারি দুন বাহু ধরি, সুদৃঢ় করি বাঁধবি,
শ্যাম-রুচি-তরু-তমাল-ডালে।
প্রতি দিবস শর্ব্বরী, অবশি সেথা আসবি,
সময় বুঝি তোরা সকলে মিলে।
(হামারি) ললাট-হৃদি-বাহুমূলে শ্যাম-নাম লিখবি,
তুলসী-দাম দেওবি গলে।

(হামারি) শ্রবণ মূলে শ্যাম নাম কহবি।"[৬৬]

এই যে নিজ দেহ পঞ্চভূতে বিলীন না হওয়ার অনুণয়, মৃত্যুর পরও কৃষ্ণের সঙ্গ লাভের কামনা তা কোনো স্বার্থান্বেষী বাঞ্ছা না এই নশ্বর দেহ যেন মৃত্যুর পরও কৃষ্ণের আরাধনায়, তাঁর প্রতীক্ষায় বিলীন হয়ে যায় এই তার কাম্য। এখানে অহংকার না, এ হচ্ছে ভক্তির চরমসীমা। যা দাস্যপ্রেমেরই অযাচিত রূপ। যেখানে ভক্ত সেই বিলীনের পথেও চিত্তকে কৃষ্ণাভিমুখীন করে রাখে। এই চিরন্তন অবস্থান রাধার মুখনিঃসৃত প্রতিটি পদের মধ্যে প্রকাশিত। যার মর্মে মর্মে মুখরিত হচ্ছে বিরহগাথা, অথচ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এর অতলে খুঁজে পায় দাস্যভক্তের অটল সাধনা আর তার মনের আর্তি।

উপসংহার

বৈষ্ণব সাহিত্যে এভাবেই সেদিন 'সেবাভাবনা' এক বিশেষ স্থান পেয়েছিল। যা চৈতন্যপূর্ববর্তী কালেও লৌকিক প্রেমের আবেশে বিরহের দহনজ্বালায় 'দাসভাবনার' সুপ্ত প্রকাশ ঘটেছিল কিন্তু তা চেতনার শীর্ষস্তরের গড়ে ওঠা অনুভূতির প্রকাশ ছিল না তাই তখনকার সেবাভাবনা কেবল আত্মতৃপ্তির অনুদান হয়ে থেকে গিয়েছিল মাত্র আর এই অনুদানই চৈতন্যের জন্মের পর ভক্তিরসের রসায়নের দাস্যতত্ত্বের এক মহিমময় রূপ লাভ করে আর এই স্তরের সেবাবাসনায় মমত্ববোধ, নিষ্কৈতব প্রেম, আত্মবিসর্জনের সস্পৃহা, তাঁকে সুখী করার প্রয়াস আদি যোগ হয়।

সূত্রনির্দেশ

১. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, 'বৈষ্ণব পদ সমীক্ষা', কলকাতা, গ্রন্থ বিকাশ, ২০০৫, পৃ. ৪৬

২. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ৫ম সংস্করণ, ১৪২৬ সন, প্রথম অধ্যায়, পৃ. ৪৬

৩. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৫০

৪. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, ১/১৭, পৃ. ২১

৫. সেন, সুকুমার, 'চৈতন্যভাগবত', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ৭ম মুদ্রণ, ২০২১, শ্লোক ২/২৩, পৃ. ১৮৪

৬. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ১/৭, পৃ. ৮৩

৭. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৫০

৮. ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান', ৫ম সংস্করণ, ১৪২৬ সন, পৃ. ২৩

৯. দাশগুপ্ত, ডক্টর শশীভূষণ, 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে', এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৫৯, পৃ. ১৩৬-১৩৭

১০. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ১/৪, পৃ. ২০

১১. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', জিজ্ঞাসা, ১ম সংস্করণ, রাধাবিরহ, পৃ. ১৪১-১৪২

১২. 'সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', ৬০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৩৯

১৩. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ৪৩

১৪. তদেব, পৃ. ১৩৬

১৫. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', জিজ্ঞাসা, ১ম সংস্করণ, বংশীখণ্ড, পৃ. ২৬১

১৬. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৬৮

১৭. তদেব, পৃ. ১১১

১৮. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ১১০

১৯. তদেব, পৃ. ১১১।

২০. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', জিজ্ঞাসা, ১ম সংস্করণ, অথ ভারখণ্ড, পৃ. ২১১

২১. তদেব, পৃ. ২১২

২২. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ (সম্পা), মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৪, ভূমিকা

২৩. তদেব

২৪. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'গীতগোবিন্দম', গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলকাতা, শ্লোক– ১০/৯, পৃ. ১১৯

২৫. মিত্র, খগেন্দ্রনাথ (সম্পা), মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৪, ভূমিকা, শ্লোক– ৩, পৃ. ১

২৬. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ১/১০, পৃ. ৬০

২৭. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/৮, পৃ. ১৫২

২৮. চৈতন্য যখন–

"প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্যগীত কৈল।
দেখি সর্বলোকের চিত্তে চমৎকার কৈল।।
আশ্চর্য শুনিয়া লোক আইলা দেখিবারে।
প্রভু-রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে।
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বলে কৃষ্ণ হরি
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্ধ্ববাহু করি।।"

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/৮, পৃ. ১৩৮

২৯. " অদ্বৈত আচার্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন।"
'চৈতন্যভাগবত', ১/৬, পৃ. ২৩

"স্বভাবে অদ্বৈত বড় করুন হৃদয়। জীবের উদ্ধার চিত্তে হইয়া সদয়।
মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার। তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার ।
তবে শ্রীদ্বৈত সিংহ আমার বড়ঞি। বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাও হেথাঞি।"
'চৈতন্যভাগবত', ১/২, পৃ. ৬

৩০. শ্রীধর-দেবগোস্বামী (সম্পা), 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ, কলকাতা, ১ম সং, ১৩২৬

৩১. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ,'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/৮/১৪২

৩২. উল্লেখ্য, চক্রবর্তী, অমলেন্দু, 'সৌর বনাম চান্দ্র সংস্কৃতি (ভক্তি আন্দোলন), দ্রষ্টব্য, 'ঐতিহ্য', vol- VIII, Issue-১, ২০১৭, পৃ. ৬৪

৩৩. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোকথ ২/৮, পৃ. ১৪২

৩৪. তদেব, শ্লোকথ ২/৮/১৪৪

৩৫. চট্টোপাধ্যায়, তপন কুমার, 'বৈষ্ণব পদ সমীক্ষা', কলকাতা, গ্রন্থ বিকাশ, ২০০৫, পৃ. ৪

৩৬. কৃষ্ণ রাধাকে বলছেন–

'ব্রজলোকের প্রেম শুনি আপনাকে ঋণী মানি
করেন কৃষ্ণ তারে আশ্বাসন।
ব্রজবাসী যতজন মাতা-পিতা সখীগণ
সবে হয় মোর প্রাণসম
তারমধ্যে গোপীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন
তুমি মোর জীবনের জীবন।।'

মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/১৩, পৃ. ১৯০

৩৭. শ্রীধর-দেবগোস্বামী (সম্পা), 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ, কলকাতা, ১ম সং, ১৩২৬, ৩য় লহরী, শ্লোক– ২৯, পৃ. ২০৫

৩৮. 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', শ্লোক– ২/১৯

৩৯. 'শ্রীমদ্ভাগবত'– ৪/৩১/১৪

৪০. শ্রীমন্ত শংকরদেব : 'শ্রীমদ্ভাগবত', ২য় স্কন্ধ, দ্রষ্টব্য : শ্রীমন্ত শংকরদেব সঙ্ঘ (প্রকা) : মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেব বাক্যামৃত, পৃ. ২৫৫।

৪১. শ্রীধর-দেবগোস্বামী (সম্পা), 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন-সঙ্ঘ, কলকাতা, ১ম সং, ১৩২৬ পৃ. ১৭৯

৪২. তদেব, পৃ. ২২০

৪৩. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫,

'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/৬, পৃ. ১৩৪

৪৪. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ,'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা, ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ৩/২০, পৃ. ৪২৫

৪৫. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৪২৬

৪৬. তদেব, পৃ. ৫৬৪

৪৭. ভট্টাচার্য, দীনেশ চন্দ্র (সম্পা), 'শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম', ভক্তি কার্যালয়, হাওড়া, ১ম সং, ১৩২২ সন, পৃ. ১৯

৪৮. তদেব, পৃ. ২১

৪৯. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ৫৮১

৫০. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ৫৮১

৫১. তদেব, পৃ. ৫৬৩।

৫২. চৈ. চ. ২/১৪/১৯৬

৫৩. কীর্ত্তন-ঘোষা, শ্লোক ১৬৩১

৫৪. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০ পৃ. ৭৪৩

৫৫. তদেব, পৃ. ৯৭৩

৫৬. তদেব, পৃ. ৯৭৩

৫৭. তদেব, পৃ. ৫৬২

৫৮. তদেব।

৫৯. বিদ্যারত্নেন, শ্রীরামনারায়ণ(অনু), 'উজ্জ্বলনীলমণি', তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১ম সং, ১৪১৪, অথ যুথেশ্বরী, শ্লোক– ৪, পৃ. ২১৬

৬০. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা),'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৩৯৪

৬১. বিদ্যারত্নেন, শ্রীরামনারায়ণ(অনু), 'উজ্জ্বলনীলমণি', তারা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১ম সং, ১৪১৪, নায়িকাভেদঃ, শ্লোক– ৫১, পৃ. ২০৭

৬২. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৪৩৪

৬৩. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', রিফ্লেক্ট পাব্লিকেশন, কলকাতা , ১২দশ মুদ্রণ, ২০০৫, 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', শ্লোক– ২/১৮, পৃ. ২৪৪

৬৪. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা), 'বৈষ্ণব পদাবলী', সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় সং, ২০০০, পৃ. ৪৩৪

৬৫. তদেব, পৃ. ৪৩৪

৬৬. উল্লেখ্য, সেন, দীনেশ চন্দ্র, 'পদাবলী-মাধুর্য্য', প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃ. ৬০